WBMDFC

WBMDFC KNOWLEDGE SERIES XII

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

(১৪৯৩–১৫১৯)

Alauddin Husain Shah

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

(১৪৯৩-১৫১৯)

লেখক

আনিসুল হক

মুল্যায়ন ও প্রমাণীকৃত

ডঃ সাফুরা রাজেক

Alauddin Hussain Shah

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব, জানুয়ারী, ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

Printed at Saraswaty Press Limited

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ড. পি. বি. সেলিম
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সর্ম্পকৃত এই পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।

শাকিল আহমেদ, আই.এ.এস
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

(১৪৯৩-১৫১৯)

প্রাক-মোঘল যুগে বঙ্গদেশে এক নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে, যা 'হুসেনশাহী' রাজবংশ নামে খ্যাত। হুসেনশাহী আমল ছিল বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং জনপ্রিয়তার কারণে ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী একদিকে গৌড়ে অনাচার, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অন্যদিকে হাবসি শাসনের অন্ধকারময় যুগের কারণে বঙ্গদেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়ে হুসেন শাহ মসনদের শাসনভার গ্রহণ করে দীর্ঘকালীন শান্তি ও স্থিতাবস্থার যুগ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী শাসক, যিনি শুধুমাত্র প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামরিক সাফল্য অর্জন করেননি, বরং বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে তাঁকে 'প্রজা বন্ধু' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হাত ধরেই বঙ্গদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা, সংস্কৃতির বিস্তার, সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই রাজবংশ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বঙ্গদেশে এক গৌরবময় শাসনের সূচনা করেছিল। সুতরাং সবদিক দিয়ে বিচার করলে অনুমান করা যায় বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ'ই ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জীবন ছিল খুবই রহস্যাবৃত। বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা ও লিপি থেকে জানা যায় জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন আরবীয়, বংশগতভাবে ছিলেন সৈয়দ বংশীয়। তাঁর পিতার নাম ছিল সৈয়দ আরশাফ আল-হুসেনী। 'রিয়াজ' প্রণেতা সলীম

একখানি ফারসি পাণ্ডুলিপি উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছেন, হোসেন শাহ তাঁর পিতা এবং ভাই'কে নিয়ে তুর্কীস্তানের তরমুজ শহর থেকে বঙ্গদেশে আসেন এবং রাঢ় অঞ্চলের চাঁদপুর এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এখানেই হুসেন শাহের বিবাহ হয় এবং মুজাফ্ফর শাহের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে নিজ প্রতিভার বলে 'উজির' পদ লাভ করেন। যদিও মুর্শিদাবাদে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে মনে করা হয় হুসেন শাহ মির্জাপুর থানার চাঁদপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে লিখেছেন হোসেন শাহ রাজা হওয়ার পূর্বে গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকুরি করতেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন-

"পূর্বে যাবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী
হুসন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী"

অর্থাৎ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জীবনের শুরুর দিক নিয়ে একাধিক মতামত উঠে আসে। কাজেই তাঁর জীবন যে রহস্যাবৃত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে যারা তাঁর জীবনের কথা লিখেছেন তাঁরা কেউই সমসাময়িক নন, কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করে অনেক সময় তাঁরা বক্তব্য রেখেছেন। কিংবদন্তীর সবকিছু সত্য হওয়া সম্ভব নয়। আবার এটাও ঠিক কিছু সত্য না থাকলে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে না। এখানেও তেমনি কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে অসামান্য সব তথ্য উঠে আসে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বাল্যকাল বিষয়ে। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত জনশ্রুতি এবং রিয়াজের বিবরণের মধ্যে 'চাঁদপুর' এবং 'চাঁদপাড়াতে' হুসেন শাহের বাল্যজীবন বেড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'মুর্শিদাবাদের কিংবদন্তীর' পর্যবেক্ষণ থেকে হুসেন শাহের কর্মজীবন বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে। এক বিবরণে বলা হয়েছে হুসেন শাহ ব্রাহ্মণের অধীনে চাকরি করতেন এবং অন্য বিবরণে বলা হয়েছে তিনি গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরি করতেন। তবে বিবরণগুলির উপর নির্ভর করে

অনুমান করা যায় যে, হুসেন শাহ সিংহাসন আরোহণের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে ছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে চাকরিতে উন্নতি লাভ করতে থাকেন। মুজাফ্‌ফর শাহের উজির নিযুক্ত হওয়ার পরে তাঁর ভাগ্য খুলে যায় এবং পরে তিনি সুযোগ বুঝে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঠিক কবে সিংহাসনে বসেছিলেন সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর নামে জারি করা মুদ্রা থকে অনুমান করা যায় তিনি ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। ১৯১৪ খিষ্টাব্দে মালদহে পাওয়া একটি লিপিতে তাঁকে 'খলিফা-তুল্লাহ' বলা হয়েছে। হুসেন শাহ সিংহাসনে বসার পরেই তিনি যেভাবে নিপুণতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তা থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্মঠ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং দূরদর্শী। তাঁর শাসনকাল শান্তি, সমৃদ্ধি এবং রাজ্যজয়ের কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সুলতান মুজাফ্‌ফরের রাজত্বকালে যে সমস্ত পাইকরা বেতন না পাওয়ার কারণে লুঠপাঠ চালিয়েছিলেন সুলতান হুসেন শাহের প্রথম কাজই ছিল তাঁদের কঠোর হাতে দমন করা। এই সময়ে যে সমস্ত পাইকরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন সুলতান তাঁদেরকে শাস্তি প্রদান করে মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি এই সমস্ত পাইকদের পরোপুরি নির্মূল করার জন্য হুসেন শাহ প্রাসাদ রক্ষীদের পর্যন্ত বিতাড়িত করেছিলেন।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে হাবসী কুশাসনে বঙ্গদেশে যে অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়েছিল, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সেই কুশাসন থেকে বঙ্গদেশকে মুক্ত করে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে যত্নবান হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হাবসি প্রাসাদরক্ষী সেনাদলের ক্ষমতা সংকুচিত করে, তাঁদের বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি কঠোর হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। পুরাতন আমলের কর্মচারীদের বরখাস্ত করে, তিনি সমস্ত দপ্তরে নতুন ও নিজ অনুগত লোকেদের নিয়োগ করেছিলেন। দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা কঠোর হাতে দমন করে

বহু ধনসম্পত্তি উদ্ধার করেন। ফিরিস্তার মতে, বঙ্গদেশে তখন ধনী ব্যক্তিরা উৎসবে সোনার থালা ব্যবহার করতেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এরকম প্রায় তেরশো সোনার থালা উদ্ধার করেছিলেন।

'রিয়াস-উস-সালাতীনে' উল্লেখ পাওয়া যায় হুসেন শাহ সিংহাসনে বসার অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, হাবসীদের নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে মুঘল এবং আফগান উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চলছিল এবং উত্তরভারতে অধিকাংশ শাসক তখন স্বাধীন। এই সুযোগে হুসেন শাহ সমগ্র বঙ্গদেশের তিনখণ্ডকে একই সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে এনে বঙ্গদেশের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। গোলাম হুসেন লিখেছেন 'হুসেন শাহ তাঁর রাজকীয় আবাস গৌড় থেকে উত্তরে একডালা দূর্গে স্থানান্তরিত করেন।'

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনকালে বাংলা সামারিক শক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ওড়িশা, ত্রিপুরা এবং আসামের কিছু অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে সুলতানি সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক কার্যাবলীকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. বিহারের যুদ্ধজয়

খ. কামরূপ ও আসামের সঙ্গে যুদ্ধ

গ. উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ

ঘ. ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ

ঙ. চট্টগ্রাম অধিকার

এই সামরিক সাফল্যের ফলে বাংলার সুলতানি শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রতিবেশি রাজ্যগুলির সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং বঙ্গদেশকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেন।

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরের শাসক শাহ সার্কী দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে বঙ্গদেশের দিকে পলায়ন করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তখন বাংলার সুলতান। এই সময়ে তিনি সার্কী সুলতানকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁর রাজ্যে থাকার সুব্যবস্থা করে দেন। সিকান্দার লোদি ইহাতে বাংলার সুলতানের প্রতি বিরক্ত হয়ে বঙ্গদেশ আক্রমণের আদেশ দেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ থেমে থাকেননি, তিনি তাঁহার পুত্র দানিয়ালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন সিকান্দার লোদির বিরুদ্ধে দিল্লির 'রাঢ়' নামক স্থানে উভয়পক্ষের সৈন্য মুখোমুখি হয়েছিলেন যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু কোনও কারণে এই যুদ্ধ সম্পাদন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কোনও পক্ষের শত্রুকে আশ্রয় না দেওয়ার শর্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এরপরে সিকান্দার লোদী বিহার, তুগলকপুর এবং সারণ জেলায় নিজস্ব গভর্নর নিযুক্ত করে শাসনের সুব্যবস্থা করেন।

'রিয়াস-উস-সালাতিনের' বক্তব্য অনুযায়ী এরপর হুসেন শাহ সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেন। ফলে বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্বে কামরূপ, কামতা জয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই জয়লাভ সুনিশ্চিত করার পরে তিনি অসংখ্য পদাতিক সৈন্য এবং যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে অসম জয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সফলভাবেই তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্তর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেন। এই সুযোগে হুসেন শাহের সেনাবাহিনী সংস্কারের নামে অসমে অট্টালিকাসমূহ ধুলিসাৎ করে নতুন করে অট্টলিকা নির্মাণের কাজে লেগে পড়েন। হুসেন শাহের ভয়ে অসমের রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান। এই সুযোগে হুসেন শাহ তাঁর সেনাবাহিনী সমেত নিজ পুত্রকে বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব অর্পন করে বিজয় গৌরবে স্বদেশে ফিরে আসেন। হুসেন শাহ ফিরে আসার পরে তাঁর পুত্র বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু হুসেন শাহের পুত্রের সিংহাসনে বসার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই

অসমে বর্ষার আবির্ভাব ঘটে। এই সময় ঝর্ণার জলে অসম প্লাবিত হতে থাকে এবং সেই সুযোগে অসমের রাজা পুনরায় নিজের অনুচর বৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে অসমের মধ্যে প্রবেশ করে বঙ্গদেশের সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলেন। পুনরায় যুদ্ধ সম্পাদিত হয়, যুদ্ধে বঙ্গদেশের সৈন্যদের পরাজয় ঘটে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নথি থেকে পাওয়া যায় যুদ্ধের কারণে হুসেন শাহের হাত থেকে অসম হাতছাড়া হয়ে গেলেও, কামরূপ-কামতাতে তাঁর পরাজয় ঘটেনি। এখানে তাঁর আধিপত্য আগের মতই বজায় ছিল।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে জানা যায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহ শুধু অসম জয় করেই ক্ষান্ত হননি। প্রসঙ্গত 'রিয়াস-উস-সালাতিন' এবং ষোড়শ শতকে এক নামহীন 'পুঁথি' থেকে জানা যায় তিনি উড়িষ্যা জয় করেন। এমনকি চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাস একই কথা বলেছেন। তবে উড়িষ্যাতে এ প্রসঙ্গে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমকালীন প্রতিবেদন ছাড়া এখানে 'মাদলা পঞ্জিকা' নামক একটি আখ্যানে ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশের মুসলমানদের সঙ্গে ওড়িয়া বাহিনীর একটা যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমন করে পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। পরে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে এসে হুসেন শাহকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এই আখ্যানে হুসেন শাহের উড়িষ্যা জয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তাঁর মুদ্রায় সিংহাসন আরোহণের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে নিজেকে 'উড়িষ্যা বিজয়ী' বলে দাবি করেছেন। তবে হুসেন শাহের উড়িষ্যা বিজয় নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, তিনি বঙ্গদেশের সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রভাব যে উড়িষ্যা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন সেই বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন-

"যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবভূমি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে"॥

এরপরে হুসেন শাহ ত্রিপুরা অভিযানে মনোনিবেশ করেন। হুসেন শাহের ত্রিপুরা অভিযান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব শিলালিপি থেকে যেমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, তেমনি ত্রিপুরা 'রাজমালা' থেকেও বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে। ১৫১৩ সালে একটি লিপি থেকে জানা যাচ্ছে হুসেন শাহের একজন সেনাপতি ত্রিপুরা ভূমির লস্কর ছিলেন, যা থেকে অনুমান করা যায়, হুসেন শাহের ত্রিপুরা রাজ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এছাড়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর 'মহাভারতে' লিখেছেন, হুসেন শাহ ত্রিপুরা জয় করেছিলেন, শ্রীকর নন্দীও তাঁর 'মহাভারতে' এই একই কথার অবতারণা করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার সমকালীন ইতিহাস 'রাজমালা-য়' বলা হয়েছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে হুসেন শাহের দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলেছিল। ত্রিপুরারাজ ধনমাণিক্য নাকি বঙ্গদেশের সুলতানের অধীনে কিছু এলাকার দখল করে নেন এবং আরও কিছু এলাকা জয় করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এমত অবস্থায় ১৫১৩ সালে ধনমাণিক্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি চট্টগ্রাম জয় করতে পারেননি, কারণ হুসেন শাহ বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠালে ধনমাণিক্য পিছিয়ে যান। এইভাবে কয়েকবারের প্রচেষ্টায় ত্রিপুরারাজ চট্টগ্রাম দখল করতে না পেরে অবশেষে হাল ছেড়ে দেন। কাজেই ত্রিপুরার উপরে হুসেন শাহের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

হুসেন শাহী বংশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আরাকান জয়ের কাহিনি এসে পড়ে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় হুসেন শাহ ১৫১৩ থেকে ১৫১৬ সালের মধ্যে কয়েকবার আরাকান আক্রমণ করেছিলেন এবং আরাকান রাজকে নিজ সামন্তে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই হুসেন শাহের আরাকান জয়ের কাহিনি ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। প্রসঙ্গত আরাকানের সাথে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সংঘর্ষের কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন আরাকানের মগ রাজার সঙ্গে হুসেন শাহের যুদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের বক্তব্য হল- এক সময় চট্টগ্রাম ছিল ত্রিপুরা, বাংলাদেশ এবং আরাকান এই তিনটি রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত।

কাজেই চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে প্রায়শই তিনটি রাজ্যের মধ্যে বিরোধ লেগে থাকত। চট্টগ্রামের ইতিহাস থেকে জানা যায় হুসেন শাহের রাজত্বকালে আরাকানের মগ রাজা চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু হুসেন শাহ-এর ছেলে নুসরত শাহ মগদের বিতাড়িত করে সাম্রাজ্য উদ্ধার করেন। কাজেই আরাকানে যে হুসেন শাহের কর্তৃত্ব ছিল তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

তবে আরাকানের সাথে হুসেন শাহের যোগাযোগের ইতিহাস সম্পর্কে আরও একাধিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'পরাগলি মহাভারত' থেকে জানা যায়, হুসেন শাহ পরাগল খানকে পরাগালপুরের থানাদার নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লি-মজনু' গ্রন্থ থেকে জানা যায় হুসেন শাহ তাঁর এক উজির হামিদ খানকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুইটি 'সিক' বা পরগাণার দায়িত্ব দিয়ে, সেখানে বসবাস করার আদেশ দিয়েছিলেন। তদানুসারে তিনি চট্টগ্রামের সেই সময় রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র 'ফতেয়াবাদ' নগরে বসতি স্থাপন করেন। উক্ত ফতেয়াবাদ এখন চট্টগ্রামের হাট-হাজারী থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। 'ফত্-ই-আবাদ' নামটি চট্টগ্রাম বিজয়ের পর হুসেন শাহ বা তাঁর পুত্র নুসরত শাহ নামকরণ করেন। একইসাথে পর্তুগীজ নাবিকের বর্ণনার মধ্যেও হুসেন শাহের যে আরাকানের উপরে কর্তৃত্ব ছিল তা জানা যায়। পর্তুগীজ নাবিক জ্যো-সিলভেরা লিখেছেন ১৫১৮ সালে চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানের অধীনে ছিল।

এইভাবে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বীর-বিক্রমে তাঁর সাম্যাজ্যের সীমানাকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা ত্রিহুতের কিয়দংশ সমেত বর্তমান বিহার রাজ্যের বিস্তর অংশ জয় করে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। নেপালের স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির ধ্বংস করে এবং সেখান থেকে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন, তবে হুসেন শাহ নেপালে খুব বেশিদিন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে হুসেন শাহের রাজ্যের আয়তন ছিল বিরাট, বঙ্গদেশের প্রায় সমস্তটা এবং বিহারের এক বিরাট অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি

কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিছুটা অংশ সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হুসেন শাহ যে সুশাসক ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাবাকাত-ই-আকবরি, তারীখ-ই-ফিরিশতা এবং রিয়াস-উস-সালাতীনে হুসেন শাহের সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার কথা পাওয়া যায়। তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং অনুগত ছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ভারসম্য বজায় রাখার জন্য তিনি নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর এই বুদ্ধিমত্তার জন্য তাঁকে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শাসক। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা দেশের মধ্যে সে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিত তৈরী করেছিল সেখান থেকে দেশকে উদ্ধার করে স্থায়ী শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এমনকি অনেক সময় যুদ্ধ উপলক্ষে রাজ্যের বাইরে অবস্থানকালীন সময়েও, সেই সুযোগে কেউই তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেননি। তাঁর বিচক্ষণতার ফলে দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদির সাথে বোঝাপড়া তাঁর জনপ্রিয়তার চরম স্বাক্ষর বহন করে। তিনি প্রজাদের কল্যাণে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন এবং দুঃস্থ- দরিদ্রের উপকারের জন্য দেশে অনেক লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধন করে জনগণের চলাচলের সুবিধা থেকে সামরিক এবং অসামরিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

বঙ্গদেশের ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশ যে উদারতার পথে রাজ্যকে পরিচালনার পথ দেখিয়েছিলেন, হুসেন শাহের আমলে সেই পথ আরও প্রসস্থ হয়েছিল। তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রতীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সব ধর্মের প্রতি সমানভাবে উদারতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যায় ইসলাম ধর্মের উন্নতির জন্য এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারের চিন্তায় তিনি অনেকগুলি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। এই মাদ্রাসাটি ছিল ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এছাড়া মুসলমান ধর্মীয় সাধক, সুফি-সাধকদের অত্যন্ত ভক্তির চোখে

দেখতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে শায়খ নূর-কুতুব আলমের স্মৃতির প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তির কথা জানা যায়। কথিত আছে, হুসেন শাহ প্রত্যেক বছর পায়ে হেঁটে তাঁর রাজধানী একডালা হইতে পাণ্ডুয়ায় আসতেন শুধুমাত্র এই সুফি সন্তের স্মৃতির প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্য।

হুসেন শাহ ছিলেন উদারতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর এই উদারতার দ্বারা বঙ্গদেশে জাতীয় চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাগীদার হয়েছিলেন। হিন্দুদের তিনি উচ্চপদে নিয়োগ করেন এবং চৈতন্যদেবের মত প্রখ্যাত মনিষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পথ প্রসস্থ করে দিয়েছিলেন। এই ধর্মপ্রচার হিন্দুদের সামাজিক ও ধার্মিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের মতো উদার শাসক ব্যতীত বঙ্গদেশের চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সমুন্নতি সম্ভব ছিল না। ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহাবস্থানকে উৎসাহিত করে তিনি বাঙ্গলার মানুষকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের রূপ দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সাম্রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অনেকগুলি নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিকক্ষেত্র এবং উচ্চ রাজপদে হিন্দুদের নিয়োগ। রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী নামক দুই রাজকর্মচারী হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। রূপের উপাধি ছিল দাবীর খাস (মুখ্য সচিব) এবং সনাতনের উপাধি ছিল সাকের মালিক। এছাড়া সনাতনের বড় ভাই রঘুনন্দ এবং ছোটভাই বল্লভ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

এছাড়া রাজসভার অন্যান্য পদেও হুসেন শাহ নিয়োগ করেছিলেন একাধিক হিন্দুকে । যেমন কেশব বসু ছিলেন রাজার দেহরক্ষীদের নায়ক, তিনি রাজার কাছ থেকে 'খান' ও 'ছেত্রী' উপাধি পেয়েছিলেন। তাই কোনও কোনও সূত্রে কেশব রায়কে কেশব খান এবং কেশব ছেত্রী রূপে উল্লেখ রয়েছে। আবার সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের অধিকারী বা গৌড়ের শাসনকর্তা। মুকুন্দ দাস ছিলেন সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তাঁহার পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন বারবক

শাহের চিকিৎসক, যা থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায় এই দাস পরিবার পুরুষানুক্রমে রাজবৈদ্য ছিলেন। এছাড়া রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরজ্য দাস, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী সহ আরও অসংখ্য হিন্দু রাজ কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁরা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজ দরবারে উচ্চ-নিম্ন উভয় পদে রাজকর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বঙ্গদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব রূপ গোস্বামী রচনা করেছিলেন 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুটি গ্রন্থ।

আরবি-ফারসি সাহিত্যের যুগেও হুসেন শাহ বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি যে উদার হস্তে অর্থ বরাদ্দ করতে পিছুপা হননি, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক সূত্র থেকে। চৈতন্যদেবের অসাধারণত্ব হুসেন শাহ অনেক আগেই স্বীকার করেছিলেন। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি, বিশেষ করে 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃত', বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' তাঁর রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল। এছাড়া মালাধর বসু 'ভগবদগীতা' বাংলায় অনুবাদ করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ সুলতানের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ 'পরাগলী মহাভারত' হিসাবে পরিচিত হয়ে আছে।

এছাড়া হুসেন শাহের আমলে চট্টগ্রামের সামন্তরাজা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ছুটি খানের উৎসাহে শ্রীকরন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ সমাধান করেছিলেন। যদিও এইসব অনুবাদ সাহিত্যের থেকেও হুসেন শাহী আমলে বঙ্গদেশে অধিকমাত্রায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক সাহিত্যকর্মগুলির উপর যেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একাধিক কবির রচিত মঙ্গলকাব্য। এক্ষেত্রে অন্যতম ছিল বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপলাইয়ের লেখা 'মনসামঙ্গল'। এই গ্রন্থগুলি সমসাময়িক সমাজ-জীবনের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল।

অর্থাৎ সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হুসেন শাহের মতো বঙ্গদেশের কোনও সুলতানই বাঙালি জাতির এমন আতিথ্য পাননি। বাঙালি জাতি তাঁকে 'নৃপতি-তিলক, 'জগৎ-ভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন। ডঃ হাবিবুল্লাহর মতো ঐতিহাসিকরা বলেছেন, "হুসেন শাহের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর সময়ে আবুল ফজলের মতো একজন জীবনীকার ছিলেন না, যদি থাকতেন তা হলে সম্রাট আকবরের মত হুসেন শাহের জীবনের মহত্ত্ব আমাদের কাছে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত"। কাজেই এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন সুলতান বাংলাদেশে আর রাজত্ব করেছেন কিনা সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দিন হুসের শাহের সময় থেকেই বঙ্গদেশে নবজাগরণ শুরু হয়। বঙ্গদেশে প্রায় ২৬ বছর রাজত্ব করার পর এই মহান নরপতি ৯২৫ হিজরি, অর্থাৎ ১৫১৯ সালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি এই বঙ্গদেশের বুকে রেখে গেছেন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন যেমন- গৌড় নগরীর গুণমন্ত মসজিদ, দরমাবাড়ি মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ ইত্যাদি, যা আজও ইতিহাসে জীবন্ত নিদর্শন হয়ে রয়ে গেছে।

HELPLINE

1800 120 2130

VISIT US AT

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A statutory corporation of Govt. of West Bengal)

'Amber', DD-27/E, Salt Lake, Sector-1, Kolkata-700064